অন্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসঙ্গে

সাজ্জাদ জহির

ইসলামী আন্দোলন কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নয়; এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। যদিও সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদী গণতান্ত্রিক "ইসলামি" দলগুলোর তৎপরতা জনপরিসরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তথাপি আমাদের দেশের সচেতন মুসলিমরা উম্মাহবোধ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন কখনোই হয় নি। আলহামদুলিল্লাহ।

গণতন্ত্রপন্থী সংশোধনবাদীদের পুরনো ধাঁচের জাতিবাদী রাজনীতি বিশ্বব্যাপী অন্ত:সারশূণ্য হয়ে পড়েছে। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। জাতিবাদী৷ ইসলামপন্থার দুর্বলতা ও একদেশদর্শীতাকে জনপরিসরে প্রকাশ করে দেয়ার পিছনে হকপন্থী উলামায়ে কেরাম, আপোষহীন দা'ঈ এবং ত্যাগী ইসলামপন্থীদের মহান অবদান রয়েছে। এই আপসহীন ব্যক্তিদের অপরিসীম অধ্যাবসায়, শত প্রলোভন-বাধা সত্বেও আদর্শে অবিচলতার ফলেই বাংলাদেশ তিউনিসিয়া, মিশর বা মালয়েশিয়ার মত হয়ে যায়নি।

বাংলাদেশে তাই প্রকৃত ইসলামপন্থীদের এখনো সম্ভাবনা অনেকাংশেই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে আদর্শিক চেতনা, উম্মাহর প্রতি দরদ, আত্মত্যাগের স্পৃহা এখনো অনেকটাই জাগ্রত, আলহামদুলিল্লাহ। প্রশ্ন হচ্ছে, সংশোধনবাদী গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থীদের দৃশ্যত শক্তি বৃদ্ধির বিপরীতে নববী আকিদা-মানহাজ কে মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে কুফরের পাশাপাশি বিদআতি শক্তিকেও পরাভূত করে ইসলামকে বিজয়ী করার সংকল্পে আমরা অগ্রসর হতে পারব কিনা।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে এ কয়টি বিষয় সর্বদা বিবেচনায় নেয়া উচিত, তন্মধ্যে অন্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদের বিষয়টি অন্যতম।

আমাদের দেশে উম্মাহকেন্দ্রিক, জাতিবাদবিরোধী মানহাজের অনুসারীদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। সম্পৃক্ত বলতে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ। এটা কোন সমস্যা না।

সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থানরত কোন ব্যক্তি বা সংগঠন যখন অন্ধভাবে বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণকে পাশে সরিয়ে অন্য ভূমির সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত কৌশল কে আঁকড়ে ধরে।এই চিন্তাধারার অসারতা যেকোনো সচেতন, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারে৷ কিন্তু conformity এবং তাক্বলিদি চিন্তাধারা এক্ষেত্রে অনেক বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে, সংশোধনবাদী গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থীদের বিপরীতে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী হিসেবেই ইসলামপন্থীদের এই অংশটি বিকশিত হয়েছে, যদিও তারা নিজেরাও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত।

আবারো, একজন মুসলিম মাত্রই আন্তর্জাতিক। কোনো দেশের গণ্ডির মাঝে একজন ইসলামপন্থী নিজ চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। যেভাবে আমাদের প্রতিবেশী ভাইয়ের কষ্ট আমাদের স্পর্শ করে; একইভাবে কাশ্মীর, গাজা, দামেস্ক, কাবুল, বাগদাদের মুসলিমদের কষ্টও আমাদের আক্রান্ত করে, করবে। শুধু মুসলিম নয়, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর পাশে

দাঁড়ানোর তাড়না মুসলিমদের অন্তর থেকে খালি থাকতে পারে না।

যেভাবে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম, বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে সবার জন্য যেমন ইসলামী শাসন তথা শরীয়াহ কল্যাণের উৎস; একইভাবে ভারত, শ্রীলঙ্কা, জাপান, জার্মানীর জনসাধারণের আত্মিক, বৈষয়িক, পার্থিব, অপার্থিব সকল কল্যাণের একমাত্র উপায় শরীয়াহর অধীনে জীবনযাপন। এটাই একজন প্রকৃত মুসলিমের চেতনা।

লিবারেলিজম, ফ্যাসিজম ও সোশ্যালিজম বিশ্বমানবতাকে কী দিয়েছে আর ইসলাম কী দিয়েছে, দিতে পারে- তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত।

এখন, প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ইসলামকে বিজয়ী করার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের মুসলিমদের অবদান রাখার প্রক্রিয়া কী? সংশোধনবাদী, জাতিয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থীদের কাছে হয়তো এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয়।

কিন্তু প্রকৃত বিপ্লবী চিন্তার ইসলামপন্থীদের কাছে এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এজন্যই বিপ্লবী চিন্তার ইসলামপন্থীরা বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে দীন, উম্মাহ ও মানবতার খেদমতের আশু ও প্রাথমিক লক্ষ্য সাব্যস্ত করে থাকেন।

কিন্তু দু:খজনকভাবে, অন্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদী মানসিকতায় আক্রান্ত আমাদের কিছু ভাই ও সংগঠন উম্মাহর নের্তৃস্থানীয়দেরকে ভাই ও নেতার পরিবর্তে প্রভু মনে করেন। যার ফলে আমাদের দেশের এসকল সংগঠন এলোমেলো মেহনতের মাধ্যমে বাংলাদেশে উম্মাহকেন্দ্রিক চিন্তার অধীকারিদের অনুসরণীয় হবার পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে বিবেচনায় না নিয়ে, তারা উম্মাহ, শরীয়াহ, ইমারাহ, খিলাফাহর মতো পরিভাষাগুলোকে যান্ত্রিক ও সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। এর ফলে আন্তর্জাতিক সংগঠনের অনুসারী দাবিদার ইসলামপন্থীরা এক পা এগিয়ে দুই পা পিছিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা কথা বললেই ডেকে আনে বিপদ সিদ্ধান্ত নিলেই দেখা দেয় ধ্বংস।

উদাহরণত, সামরিক বাহিনীকে ক্যু করার আহবান জানানো, ঢালাও সশস্ত্র হামলা, প্রকাশ্যে গেরিলা যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া কিংবা গাজওয়াতুল হিন্দের হাদীসের ভিত্তিতে কৌশলগত রূপরেখা প্রণয়ন ইত্যাদি। এধরণের কর্মসূচী শারঈ দিক থেকে সাধারণভাবে সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু, এসকল সংগঠনের রাজনৈতিক লাইন নি:সন্দেহে - বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং ক্ষমতা, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতার পারস্পরিক সম্পর্কের সাধারণ সূত্রের আলোকে- অপ্রস্তুত, কল্পনাপ্রসূত ও অতি সরল।

এছাড়াও, অত্যাশ্চর্যের বিষয় এই যে- ভারত অধ্যুষিত রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ বা বিহারে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করা উচিৎ, এমন চিন্তাকে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অংশ সাব্যস্ত করা হয় এদেশে! অথচ এজাতীয় দুর্বল ও ক্ষতিকর চিন্তাধারার সাথে উম্মাহর নেতাদের, উলামাদের চিন্তা-চেতনা বা দিকনির্দেশনার দূরতম সম্পর্কও নেই, আলহামদুলিল্লাহ।

কেউ যদি বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মেহনত করতে চায়, তার জন্য বাংলাদেশের বাস্তবতা, এ ভূমির মাটি ও মানুষের ব্যাপারে অবগতি, অন্য দেশের ইসলামপন্থীদের চেয়ে অনেক বেশি হওয়া জরুরী।

কেননা আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সাধারণ মূলনীতিই হচ্ছে "Content is international, but form is regional/national."

উম্মাহর উন্নত অংশের আকিদা-মানহাজ-রাজনৈতিক চেতনা ও আত্মত্যাগের স্পৃহা অবশ্যই আমাদের বুঝতে ও গ্রহণ হবে। কিন্তু আমাদের দেশে শক্তিশালী সংগঠন, গণভিত্তি ও আন্দোলন গড়ে তোলার কৌশল ও রাজনৈতিক লাইন আমাদেরকেই নির্ধারণ করতে হবে। এবং যে সকল ভূমিতে সফল আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার বাস্তবতা এমনই।

সমস্যা হচ্ছে, এ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও উম্মাহর নেতাদের রচনাবলী পাঠের ক্ষেত্রে আমাদের উদাসীনতা ও সংকীর্ণতা রয়েছে।

এমনকি, উম্মাহর পুনর্জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে স্বীকৃত ইসলামপন্থী সংগঠন ও নেতৃত্বের দিকনির্দেশনা, অবস্থান থেকে আমাদের দেশের সংগঠনগুলো বিপরীত অবস্থানেই রয়েছে তা নিরাপদেই বলা যায়।

সীমানাভিত্তিক রাজনৈতিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে ঢালাও রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারনের সাথে জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, তথা জাতিয়তাবাদী সংকীর্ণ চিন্তার যে পার্থক্য রয়েছে- এই সাধারণ বুঝটিও প্রতিক্রিয়াশীলতার দরুন অন্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদী ভাইয়েরা মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারেন না বা চান না। অথচ উম্মাহর নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা -রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক জাহেলী যুগের গোত্রগুলোকে বিলুপ্ত না করে কিভাবে তা ইসলামের আলোকে শক্তি ও ঐক্যের মাধ্যম বানিয়েছিলেন- তা উল্লেখ করে, বর্তমানের রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অতএব, বাংলাদেশের যে সকল সংগঠন (প্রায় সবগুলোই আন্ডারগ্রাউন্ড) আন্তর্জাতিকতা ও উম্মাহকেন্দ্রিক চেতনা ধারণ করেন, তারা আকিদা ও আন্তরিকতার প্রশ্নে অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও অকার্যকর, স্থবির ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে মূলত চিন্তাগত অসারতা ও তাকলিদি মানসিকতার দরুন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে জনবিচ্ছিন্ন, দিগ্বিদিকশূণ্য ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ায়, এই সংগঠনগুলো অদূর ভবিষ্যতে আরো দুর্বল ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে বলাই বাহুল্য। যদি না তারা সঠিক রাজনীতি ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

১৮৫৭'র পর উপমহাদেশে প্রকৃত বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারা স্তিমিত হয়ে যাওয়ার দরুণ আলোচনার এপর্যায়ে ইসলামপন্থীদের থেকে উদাহরণ দেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

বিশেষত, নব্বই দশক থেকে ডান-বাম নির্বিশেষে সংশোধনবাদী, ক্ষমতার রাজনীতি দেখে অভ্যস্ত প্রজন্মের জন্য আদর্শিক রাজনীতির বাস্তবতা ও প্রভাব বোঝা আরো কঠিন হয়ে ওঠেছে।

তাই, অন্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদের আত্মবিনাশী প্রভাব বোঝার জন্য পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদাহরণ সহায়ক হতে পারে। বাতিল হলেও, আদর্শিক রাজনীতি হিসেবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদাহরণ বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের জন্য শিক্ষনীয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিজস্ব উদাহারণ কঠিন হয়ে ওঠার আরো বড় কারণ হলো- বিগত প্রায় ৪০ বছরাধিক বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক তথা ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির নামে সংশোধনবাদের চর্চা হয়ে আসছে। বিপরীতে ক্ষেত্রবিশেষে চর্চা হয়েছে উম্মাহকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতার।

ষাটের দশকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃতি কি হবে, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়। যার একদিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, আরেক দিকে ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টি। সোভিয়েত পার্টি আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক অধুনা ইসলামপন্থীদের ন্যায় "জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব" এর লাইন তুলে ধরে, যা কি না কমিউনিস্টদের বিপ্লবী চেতনাকে ধ্বংস করে ফেলে।

আমাদের দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের দেখানো পথে হাঁটা দল হলো পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (বর্তমানের সিপিবি), যা মস্কোপন্থী পার্টি হিসেবে পরিচিত ছিল। একসময় জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও, সোভিয়েত পার্টির অন্ধানুকরণের দরুন বাকশালে যোগ দেয়াসহ ক্রমাগত ভুলভাল রাজনীতির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে অক্ষম ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে সিপিবি।

বিপরীতে, চীনপন্থী হিসেবে পরিচিত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (M.L), (যার নের্তৃত্বে ছিল সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা) ১৯৭১ সালে পুরো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গিয়ে পাকিস্তানের পক্ষালম্বন করে। যদিও শুরুতে তারা দলিল প্রকাশ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয় ("বজলের চিঠি" শীর্ষক দলিল দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যখনই ১৯৭১ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই রেডিওতে ঘোষনা করলেন,

"পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মঙ্গল নিহিত রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ থাকার মধ্যে, অর্থাৎ পাকিস্তানের অখণ্ডতার মধ্যে। দ্বিতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানকে তারা পাকিস্তানের অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে, তারা মুষ্টিমেয় লোক।"

এর পরপরই ১৯৭১ এর যুদ্ধকে "দুই কুকুরের কামড়াকামড়ি" আখ্যা দিয়ে গনবিরোধী পথে হাঁটা শুরু করার মাধ্যমে চীনপন্থী পার্টি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পরবর্তীতে স্বাধীনতা উত্তরকালে কয়েক টুকরা হয়ে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

অন্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদ কিভাবে স্থূল চিন্তার দেশীয় সংগঠনকে বিপথে নিয়ে যায় এবং এদেশে এর প্রভাব প্রসঙ্গে বিস্তারিত চমৎকারভাবে উঠে এসেছে চীনপন্থী পার্টির তৎকালীন নেতা, বাংলাদেশ, ভারত ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক বদরুদ্দীন উমরের লেখায়। তার রচিত আত্মজীবনী থেকে, তার প্রকাশিত মাসিক সংস্কৃতি এবং মহিউদ্দিন আহমদকে দেয়া সাক্ষাৎকার থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়া সংগত মনে করছি। আশা করি তা পুরো বিষয়টি বেশ ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

বদরুদ্দিন উমর লিখেন,

"ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে লেখাপড়া জানা অনেক শিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁদের একটা অসুবিধা ছিল। নিজেদের পায়ে

খাড়া হয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না। দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল না।

লেনিন নিজের কাজ শুরু করার আগে প্রথমে দেখেছিলেন রাশিয়ার অবস্থা কী এ জন্য তিনি ২৮ বছর বয়সে সাইবেরিয়ায় আটক থাকার সময় "দ্য ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া" লিখেছেন। এতে রাশিয়ার সমাজের ওপর। বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ ছিল।

তো লেনিন দেখলেন যে পরিবর্তন যেটা করব, সেটা কী জিনিস। কার বিরুদ্ধে লড়ব, শত্রুকে তো চিনতে হবে, মিত্রকে তো চিনতে হবে। এ জন্য লেনিন ২৮ বছর বয়সে "দ্য ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া" লিখে রাশিয়ার একটি পূর্ণ চিত্র প্রস্তুত করেছেন; নিজের জন্য এবং আর যারা থাকবে তাদের জন্য।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এ রকম কোনো কাজ নেই। ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের এ রকম বিশেষ কোনো বড় কাজ নেই। এটাই হচ্ছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সমস্যা।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মাও সে তুংও এই কাজ করেছিলেন। চীনা সমাজের বিশ্লেষণ যেভাবে মাও সে তুং করেছিলেন, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহ্যের মধ্যে এটি নেই। উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হচ্ছে, তাদের বর্ণপ্রথা সম্পর্কে কিছু জানা নেই।

সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্ণপ্রথা হচ্ছে মস্তবড় একটা বাধা। তারা বর্ণপ্রথার ওপর কোনো কাজ করেনি। এটি খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এ জন্য দেখা যাবে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সব উচ্চশ্রেণির লোক। এখানে নিম্নশ্রেণি থেকে কেউ উঠে আসেনি। মুসলমানরাও আসেনি সেভাবে। এটি অল ইন্ডিয়া লেভেলই বলুন আর বেঙ্গল লেভেলই বলুন। বেঙ্গল লেভেলে সব চ্যাটার্জি, মুখার্জি, ব্যানার্জি, বসু-এসব উচ্চশ্রেণির মানুষ।

ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির এ দুর্বলতা দেশবিভাগের পর এখানে আরও বেশি হলো। এখানকার হিন্দুরা চলে গেল। মুসলমানের সংখ্যা। কম ছিল।

শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা কমিউনিস্ট পার্টিতে খুব সামান্য ছিল। এ জন্য তারা একসময় ঠিক করেছিল, ওখান থেকে কিছু মুসলমান এখানে পাঠাবে। আব্দুল্লাহ রসুল, আমার ভাই মনসুর হবিবুল্লাহ-তাঁদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছিল। আব্দুল্লাহ রসূল তো অল্প কিছুদিন থেকেই চলে গেলেন।

আমি যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলাম, তখন তোয়াহা, আবদুল হকসহ কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ হতো কিন্তু তাঁরা কোনো বিষয়ে সিরিয়াস আলোচনায় যেতেন না। দেশের পরিস্থিতি খুব আসা ভাসা আলোচনা করতেন তাঁদের কোনো দলিল ছিল না, দোখাও ছিল না কারও, চিন্তাভাবনাও কিছু ছিল না।

এটাই এখানের মূল সমস্যা ছিল। পিকিংপন্থী যে পার্টিতে এলাম, সেখানে সে রকম শিক্ষিত লোকজন দেখিনি: মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদেরও সে অবস্থা ছিল। মণি সিংহের তো বিশেষ কোনো পড়াশোনা ছিল না। ফলে তাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-

বিশ্লেষণ ছিল না। এ জন্য মনি সিংহদের দেখা যেত ষাটের দশকের দিকে শেখ মুজিবের সঙ্গে চলাচলি করতে। এসব করার কারণ, এখানে শেখ মুজিব কে ছিলেন, শেখ মুজির কিসের প্রতিনিধিত্ব করতেন-এসব ধারণা তাঁদের ছিল না।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজনের পর এখানে একদল পিকিংপন্থী এবং আরেক দল মস্কোপন্থী হলো। এটি করতে গিয়ে তাঁরা অনেক রকম বাগাড়ম্বর করলেন তাদের দলিলে। তাঁদের দলিলের কোনো অভাব হয়নি। কিন্তু এসব দলিল ছিল অন্তঃসারশূন্য। এগুলোর মধ্যে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ-বিশ্লেষণ কিছু নেই।"

"পূর্বেই বলেছি, ষাটের দশকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে বিভক্তি এসেছিল, তার ঝাপটা এদেশেও লেগেছিল। এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়েছিল। পিকিংপন্থী গ্রুপগুলো অন্ধভাবে চীনা লাইন অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের জাতীয় স্বার্থ ও স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়েছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিষয়টি নগ্নভাবে দেখা দিয়েছিল।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বদরুদ্দীন উমর কিছুদিন গ্রামে ছিলেন। এই সময় তিনি জানতে পারেন, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন। বদরুদ্দীন উমরের এটি ভালো লাগেনি। চীনা পার্টির এই অবস্থানের কারণে তাঁর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য ছিল এ রকম:

"এভাবে ধলুইতলায় কয়েক দিন থাকার পর এক সন্ধ্যায় রেডিওর খবর শুনছিলাম সেটা ছিল ১৪ এপ্রিলের সন্ধ্যা। আমাদের সঙ্গে একটা ছোট ট্রানজিস্টর রেডিও ছিল। খবরে বলা হলো যে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই পাকিস্তান সরকারের কাছে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মঙ্গল নিহিত আছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ থাকার মধ্যে, অর্থাৎ পাকিস্তানের অথগুতার মধ্যে। কাজেই পাকিস্তানকে অখন্ড রাখা দরকার দ্বিতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানকে যারা পাকিস্তানের অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে তারা মুষ্টিমেয় লোক, handful of people.'

চৌ এন লাইয়ের এই বিবৃতির কথা শুনে আমি তো খুব চিন্তিত হলাম। কারণ, আমাদের নেতাদের আমি অল্প দিনের মধ্যেই চিনে ফেলেছিলাম। তাঁদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার ক্ষমতা কতটুকু সে বিষয়েও আমার একটা ধারণা হয়েছিল তা ছাড়া সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার এই ছিল যে চীনা পার্টির আন্তর্জাতিক লাইনের সঙ্গে একমত হতে গিয়ে তাঁরা চীনের পার্টিকে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি মনে করতেন না। তাকে মনে করতেন তাঁদের প্রভু পার্টি।

এ অবস্থায় চৌ এন লাইয়ের বক্তৃতা যে তাঁদের আগের চিন্তাভাবনাকে উল্টে দিয়ে অন্য রকম করবে, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না।

তাঁরা নিজেরা যেহেতু নিজেদের দেশীয় পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতেক অপারগ ছিলেন, সে কারণে এই চীনা বিবৃতিকেই নির্দেশ হিসেবে শিরোধার্য করে তাঁরা উল্টো পথ ধরবেন।

১ এপ্রিল ঢাকায় হামিদা রহমানের বাসায় পার্টি সেক্রেটারি, তোয়াহা ও আবদুল হকের সঙ্গে বসে যেসব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঐক্যবদ্ধ কাজের ব্যাপারে, অন্য বামপন্থী দল ও সেই সঙ্গে আওয়ামী লীগের সঙ্গেও তার কোনো শ্রাব্যতা

এখন আর থাকবে না এবং তাদের সঙ্গে, বিশেষত আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে তৈরি হবে বৈরিতা ও সংঘর্ষের পরিস্থিতি। এই বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা ভেবে আমি বেশ অস্থির হলাম জাফরও বুঝতে পারছিল পরিস্থিতি এবার কোন দিকে যাবে।

আমাদের পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন নিয়ে বিতর্কের সময় চীনাদের দ্বারা সূত্রায়িত লাইনের সমর্থক ছিল। আমি এই লাইনকেই মোটামুটি সঠিক মনে করতাম এবং সে কারণে এই পার্টিতেই যোগদান করেছিলাম।

এখনো পেছন ফিরে দেখে আমি নিশ্চিত যে তৎকালীন পরিস্থিতিতে আমার এ সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।

কিন্তু যা পরে দেখা গেল তা হলো, আমাদের পার্টি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এই আন্তর্জাতিক লাইনের বিকাশ না ঘটিয়ে কর্তাভজা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চীনা পার্টি ও চারু মজুমদারের লাইন অন্ধভাবে অনুসরণ করে চরম দেউলিয়াপনার পরিচয় দিল।"

"চীনা পার্টি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ বা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের নীতি নির্ধারণ করেছিল, সে কথা ভাবলে অবাক লাগে। কারণ, তার মধ্যে তাদের জাতীয় স্বার্থের স্বাক্ষর ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। সেই আন্তর্জাতিকতাবাদে বিপ্লবী লাইনের সহায়তার পরিবর্তে তার মধ্যে শক্তিশালী উল্টো প্রবণতা লক্ষ করে আমি মর্মাহত হয়েছিলাম।

চীনের জাতীয় স্বার্থে ভারত-বিরোধিতা ও পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার তাগিদ থেকেই ১৯৭১ সালে চীনা পার্টি আমাদের সর্বনাশ করেছিল। তবে আগেই বলেছি যে এর জন্য শুধু চীনা পার্টিকে দোষারোপ বা দায়ী করা ঠিক নয়।

আমাদের পার্টি একটি সাবালক কমিউনিস্ট পার্টি হতো, তারা যদি নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও লাইন নির্ধারণ করতে সক্ষম হতো, তাহলে চীনা পার্টি যা-ই বলুক, কিছু এসে যেত না। কিন্তু আমাদের পার্টি সে ধরানোর স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে জো-হুজুরগিরি করায় আমাদের সর্বনাশ রোধ করা আর সম্ভব হয়নি।"

"আমি যদি বিপ্লব করতে চাই, আমাকে আমার দেশটা সম্পর্কে বুঝতে হবে। লেনিন বা মাও সে তুং যেভাবে বুঝবেন তার চেয়ে ভালোভাবে আমাকে বুঝতে হবে।

আমার যদি সে ক্ষমতা না থাকে, তাহলে আমি এখানে বিপ্লব করতে পারব না।

এখানকার অবস্থা এমন ছিল যে তারা ভাবত, মস্কো ও পিকিং আমাদের চেয়ে ভালো বোঝে। চৌ এন লাইয়ের বক্তব্যের পর তাদের মাথায় ঢুকে গিয়েছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ঠিক নয়। তারপরও লড়াই হয়েছিল অনেক জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে, কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে তো আর কোনো অবস্থা থাকল না।"

(উদ্ধৃতি সমাপ্ত)

সারকথা হলো, যদি না বাংলাদেশের নের্তৃত্ব ও সংগঠনগুলো নিজস্ব সংগ্রামী অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক ও কার্যকর বৈপ্লবিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া নির্ধারণে ব্যর্থ হয়; সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আকিদার যথার্থতা, নিখাদ আন্তরিকতা, আত্মত্যাগের ব্যাপ্তি, উম্মাহকেন্দ্রিক চেতনা কিংবা বৈশ্বিক সংযোগ কোনো ফলাফল এনে দিবে না।

বিশ্বব্যাপী ইসলামের উত্থানের যে ঢেউ আজ বাংলাদেশেও লেগেছে, তা কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হওয়া তো যাবেই না, বরং ব্যর্থতার বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়ার মাধ্যমে পেছনেই পড়ে থাকতে হবে।

কুরআনী আকিদা, নববী হিদায়াত, সালাফদের মানহাজ এবং উম্মাহর সংগ্রামী নের্তৃত্বের দিকনির্দেশনাকে কেন্দ্রে রেখে- বিপ্লবী নের্তৃত্ব ও সংগঠনের জন্য রাজনৈতিক লাইন সুনির্দিষ্ট করা ব্যাতীত, স্রেফ কিছু আলংকারিক কথার ফুলঝুরি আমাদের সময়, শ্রম ও আত্মত্যাগকে পূর্ণতা দিতে সক্ষম হবে না।

এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত এবং নিজস্ব সংগ্রামী ও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বিকশিত নের্তৃত্ব ও সংগঠন ব্যাতিত স্রেফ বিপ্লব আমদানির ফিকর ব্যার্থ হবেই।

এই বাস্তবতায় নিরাপদে একথা বলাই যায়, এই ক্রান্তিলগ্নে আমাদের সময় এসেছে জনতুষ্টিবাদের মতো স্থূল আবেগ, জনবিচ্ছিন্নতা ও অন্ধত্বের অনুসরণ পরিত্যাগ করে বিকল্প পথ বেছে নেওয়ার।

আর আল্লাহ তা আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।